চোখের আলোয়

বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ক্লাসের মধ্যে হঠাৎ করে শুনতে খারাপ লাগলেও, কথাটা কিন্তু বেড়ে বলেছেন হিস্ট্রির এস. এম।

ক্রান্তির দিকে আড়চোখে তাকায় সুনয়নী।—কোন কথাটা?

—আগে সোজাসুজি তাকা সু। তোর ঐ বিলোল কটাক্ষে আমারই ভাই মূর্ছা যাওয়ার দশা; তাতে ছেলেগুলোর অমন ফিদা হওয়া তো খুব স্বাভাবিক।

—বাজে কথা রাখ্। স্যারের কথাটা বল্।

—কোন্‌টা বাজে কথা সু? ছেলেগুলোর পাগল হওয়া, না; তোর অপূর্ব সুন্দর চোখ দু'টো?

—আঃ, বল না...

—ঐ যে উনি বললেন, 'ফুলের গন্ধ আর গুয়ের গন্ধ কখনো ঢাকা যায় না।' স্যার নিশ্চয় স্রেফ সুগন্ধ আর দুর্গন্ধের কথা বোঝাতে চান নি। ভালো-মন্দের কথা বলতে চেয়েছিলেন উনি। দ্যাখ্ সু, সুন্দর সব সময় সুন্দর। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কত মানুষের কাছ থেকে তোর চোখের সুখ্যাতি তুই শুনে আসছিস্ বল্?

—হঠাৎ আমার চোখ নিয়ে পড়লি কেন বল্ তো ক্রান্তি?

পাশ থেকে মৌ খোঁচা দিয়ে সুনয়নীকে বলে, 'বল্ না, শুধু দেখলে হবে? খরচা আছে।'

এমনি করে প্রায় প্রতিদিন টিফিন ও অফ্-পিরিয়ডে বিরামপুর কলেজের ক্যান্টিনকে হাসিঠাট্টা আনন্দে ভরিয়ে রাখে সুনয়নীর প্রিয় পাঁচ বান্ধবী। পঞ্চপাণ্ডবী।

* * * *

বিরামপুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ইতিহাসের ছাত্রী সুনয়নী মুখার্জি। অতি সাধারণ এক নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে। বাবা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক।

লেখাপড়াতে সু তেমন মেধাবী নয়। কিন্তু মিষ্টি মিশুকে স্বভাবের জন্য সুনয়নী কলেজের প্রায় সকলেরই প্রিয়।

আসলে সুনয়নী ঠিক সেই অর্থে গুণবতী আদৌ নয়। আহামরি

রূপবতীও নয়। তবে শ্যামলা লাবণ্যে ওর মধ্যে একটা আলগা শ্রী আছে। আর আছে ভারী সুন্দর দুটি চোখ।

তার সেই অনুপম চোখ কোনো উপমাতে ধরা যাবে না। 'কুমারসম্ভব'-এর মহাকবি কালিদাস পার্বতীর চোখ দেখে খুব ধন্দে পড়েছিলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, হরিণীর চোখ পার্বতী নিয়েছে, না পার্বতীর চোখ হরিণী?

সুনয়নীর চোখ দু'টি সে সব কিছুকেও ছাড়িয়ে যায়। শুধু টানা-টানা কাজল-আঁখি নয়। ছল্‌ছলে। করুণ। মায়াবি। ভাষাময়।

* * * *

—তোর নাম কে রেখেছিল রে সু?

—ঠাকুমা। আমার শুধু নামই দেন নি সেই জেদি রূপসী, বাবা-মাকে স্পষ্ট বলেও দিয়েছিলেন, 'আদিখ্যেতা করে তোরা কেউ ওকে আর অন্য কোনো নামে ডাকবি না।' বিধবা বুড়ির দাপটও ছিল। সেই থেকে আমার একটাই নাম। স্কুল-কলেজে, বাড়িতেও। আমার কোনো ডাক নাম নেই।

—কেন, আমরা তো তোকে সু বলে ডাকি।

—তোদের ঐ ডাক আমার খুব ভালো লাগে রে।

চরণ এসে কী একটা বলতে যাচ্ছিল। অরুন্ধতী চেপে ধরে। বল্ আগে, তুই কার দিকে তাকিয়ে? আমার, ক্রান্তির, দেবমিত্রার, মৌয়ের, সুব্রতার, না...

—ছিঃ। কী হচ্ছে অরু? বেশ রূঢ়ভাবেই কথাটা বলে সুনয়নী।

অপ্রস্তুতের হাসি ছড়িয়ে চরণ বলে, 'ধ্যুৎ; আমি তোদের কথায় কখনো কিছু মনে করি নাকি?'

ভুলটা অরুন্ধতীর। আড্ডা মারতে মারতে ওর মাথার ঠিক থাকে না। ঠাট্টাটা চরণের দুর্বল জায়গায়...। ঠিক হয়নি। একেবারেই ঠিক হয় নি।

চরণ; মানে ইতিহাসের পদ্মাক্ষিচরণ চৌধুরী। ক্রান্তি-দেবমিত্রা-মৌ-অরুন্ধতী-সুব্রতাদের বেস্ট ফ্রেন্ড পদ্মাক্ষি। কলেজের সবাই পদ্মাক্ষিকে পঞ্চপাণ্ডবীর চরণ বলে খ্যাপায়। চরণ একটু ট্যারা।

সন্তানের প্রতি মায়ের অন্ধত্ব বা দুর্বলতা ব্যাপারটার মধ্যে বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বার্থহীন প্রশ্রয় আর ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখতে তাই মায়েদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। চরণের মা-ও তো মা।

—পদ্মাক্ষিকে ওভাবে বলাটা তোর উচিত হয়নি অরু।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেদিনের আড্ডায় অরু আর একটাও কথা বলে নি।

* * * *

সময় কখনো থেমে থাকে না। তবে সুনয়নী, চরণদের নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবীর কলেজ- লাইফটা বেশ হৈ-হৈ করে কেটে যাচ্ছে।

'চিরকালের মতো আমাদের কলেজ-জীবনটা শেষ হতে চলল, বল দেবু?' ক্রান্তির কণ্ঠে বর্ষার আগমনী।

মৌ বললে, 'এই শনিবার নবীন-বরণ উৎসব। এটাই কি কলেজে আমাদের শেষ অনুষ্ঠান অরু?'

প্রথম বর্ষের নবীনদের বরণ করে নেবে সদ্য তৃতীয় বর্ষের সুনয়নী, পঞ্চপাণ্ডবী, চরণরা। এটা নিয়ে ছেলে-বন্ধুদের কাছে সুনয়নীর একটা জোর দাবি ছিল। ঠিক দাবি নয়, আবদার। তার কথা রেখেছিল ছাত্র-সংসদের ছেলেরা।

সুনয়নীর মা খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। সে অবশ্য অনেককাল আগের কথা। স্বপন গুপ্তের ছাত্রী ছিলেন তিনি। মায়ের গলা মেয়ে না পেলেও, রবীন্দ্রসংগীতটা পাগলের মতো ভালোবাসে সু। ওর প্রিয়তম শিল্পী স্বপন গুপ্তকে কলেজের নবীনবরণ উৎসবে আনা হয়েছিল।

বন্ধুদের কাছে জেদ ধরে বসেছিল সে। সু-র একটাই কথা ছিল, 'আমরা তো চলে যাচ্ছি; আর কখনো বলতে আসব না তোদের। এবারে আর ব্যান্ড নয়; স্বপন গুপ্ত এবং ...।'

ছেলেরা বলেছিল, 'ঠিক আছে সুয়োরানি। আর সেন্টুতে ঘা দিয়ে কথা বলতে হবে না, তাই-ই হবে।'

* * * *

সত্যি অসাধারণ গলা মানুষটার।

অরুর কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত। কী গাইলেন গুরু। 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে আমার পরাণে কেন পড়িবে না?'

উচ্ছ্বাসে মৌ বরাবর ফার্স্ট। 'ফাটাফাটি মাইরি।'

কলেজ ছাড়ার আগে ক্যানটিনে সেটাই ছিল সুনয়নীদের শেষ বড়ো আড্ডা।

সেদিনের গোটা আড্ডার বিষয়টা প্রথম থেকে সিরিয়াস হয়ে উঠেছিল। অন্য দিনগুলোর মতো একটুও হাল্কা হাসি-ঠাট্টা ছিল না তাতে। খুব গভীর। গম্ভীর। বিষণ্ন। সেটা স্বপন গুপ্তের অ-সাধারণ গাওয়ার জন্য; না, বন্ধুদের কলেজ-জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার বেদনা, কে জানে?

পরপর পাঁচটা গান গেয়েছিলেন সেদিন স্বপন গুপ্ত। শেষ গানটা ছিল ঃ

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে।।'

গানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কাকে বলে তা সেদিন গোটা কলেজ দেখেছিল। একটা অন্ধ মানুষ গান দিয়ে চারদিকে কী অপূর্ব এক আলো ছড়িয়ে গেলেন। কোনো চক্ষুষ্মান গায়কের পক্ষে বোধ হয় ঠিক এমনটি সম্ভব হত না। অন্ধ বলেই কী অমন আলোক-আকুলতা! সে যে কী গভীর আর্তি তা বলে বোঝানো যাবে না।

কে নাম রেখেছিলেন ওঁনার? উনি কি জন্মান্ধ? না, পরে কোনো দুর্ঘটনায়? স্বপ্নের প্রকাশ এমন অসামান্য মাত্রায় ঘটাতে পারেন যিনি, তাঁর নাম যে কেন স্বপন গুপ্ত হল? স্বপ্ন কি মানুষ কেবল চোখ দিয়েই দেখে, না সমস্ত মন দিয়ে?

ওঁকে অমন ঠিকঠাক সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখেন কে? উনি কি বিবাহিত? নিশ্চয় ওঁনার মা আছেন। অমন পরিপাটি করে সাজানো সম্ভব কেবলমাত্র মায়ের পক্ষেই। মায়ের চোখের আলো নিয়েই বোধ হয় গানে অমন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একেই কি বলে মায়ের আশীর্বাদ; কে জানে?

* * * *

পরীক্ষা তেমন ভালো হয় নি সুনয়নীর। অনার্সটা মোটামুটি হয়েছে। কিন্তু পাশ পেপারগুলো, বিশেষ করে কমপালসরি ইংরেজিটা—। পড়াশোনাতে কোনোকালেই তেমন মেধাবী মেয়ে ছিল না সে।

পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাড়ি থেকে তাকে বিয়ে দেওয়া হবে, তা সে জানত। তাতে তারও বিশেষ আপত্তি ছিল না। শুধু পরীক্ষার আগে যেন মা-বাবা বাড়িতে ভাবি জামাই-বাবাজিদের ডাকাডাকি শুরু না করেন, সেই আপত্তিটুকু জানিয়ে রেখেছিল সু। মেয়ের প্রস্তাবে মা একটু খুঁত-খুঁত করলেও বাবার তাতে সায় ছিল।

সুনয়নীর পরীক্ষা শেষ হতেই মা-বাবা তার বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দেয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। বেশ কিছু চিঠি এল। পাত্রপক্ষের দু'-চারজন যারা এলেন, তারা প্রায় সকলেই...। মেয়ের চক্ষু-স্তুতি শুনে মা-বাবা তো গদগদ; হ্যাঁ, মানে, সবাই বলেন ইত্যাদি।

এদিকে দেখতে দেখতে এসে গেল পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার দিন। বন্ধুরা টেনশনে সকলে কলেজে চলে এল দুপুর-দুপুর। রেজাল্ট আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে গেল।

সুনয়নীর অনার্সটা ভালো হলেও কমপালসরি ইংরেজিতে সে ফেল করেছে। আবার একটা বছর?

মা-বাবার জন্য খারাপ লাগে সু-র। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো নয়। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক-পিতা বেশ কষ্ট করে মেয়ের পড়াশোনা ইত্যাদির খরচ চালিয়েছেন এতদিন। বাড়ির কথা ভেবে শুধু লজ্জাই নয়, নিজেকে যথেষ্ট অপরাধী বলেও মনে হয় তার।

বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দেয়। তুই তো এমনিতেও আর পড়াশোনা করতিস না। তোর বাবা শিগগিরি বিয়ে দিয়ে দেবেন তোকে। শ্বশুর বাড়িতে বসে আরামসে স্বামীর আদর খেতে খেতে চারটে অনার্সের সঙ্গে আর একটা পেপার দিয়ে দিবি তুই। একটাও নয়, হাফ-পেপার। সি. ইউ তো এবার জানিয়ে দিয়েছে, কমপালসরিতে ব্যাক পেলে পার্ট-টু অনার্সের সঙ্গে শুধুমাত্র সেটা দিলেই মিটে যাবে।

* * * *